চর্যাপদের ভাষা-বিতর্ক : একটি পর্যালোচনা

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ*

সারসংক্ষেপ : ১৯১৬ সালে 'চর্যাপদ' প্রকাশের পর থেকেই এর রচনাকাল ও ভাষা নিয়ে বিতর্ক চলে আসছে। তবে এর ভাষা বিষয়ক বিতর্কই ব্যাপক। দেশি-বিদেশি, বাংলাভাষী ও অন্যভাষী পণ্ডিত-গবেষকগণ এ বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের মূল্যবান অভিমত প্রদান করেছেন। এ প্রবন্ধে 'চর্যাপদ'-এর ভাষা নিয়ে প্রদত্ত গবেষকবৃন্দের অভিমতের একটি বিশদ পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৯১৬ সালে 'চর্যাপদ' প্রকাশের পরপরই চর্যার ভাষা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। পুথি আবিষ্কার (১৯০৭) ও প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যা-বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেন; কয়েকটি প্রবন্ধও লেখেন। তার মধ্যেও এই বিতর্কের উপকরণ ছিল। নেপাল থাকার সময় থেকেই শাস্ত্রীর মনেও যে ভাষা নিয়ে দ্বিধা, সংশয় ও প্রশ্ন ছিল তা তিনি চর্যাপদের ভূমিকায় স্পষ্ট করেই বলেছেন। কতকগুলো পুস্ড়ক দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে "উহার মধ্যে একরূপ নূতন ভাষায় কিছু লেখা আছে" (হরপ্রসাদ, ১৯১৬ : ৪)। "ডাকপুরুষের বচন হইবে" ধারণা করে তিন 'ডাকার্ণব' নকল করান। কিন্তু "পড়িয়া দেখি, সে বাঙ্গালা নয়, কি ভাষায় লিখিত, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না"। অন্যদিকে বেন্ডল 'সুভাষিত-সংগ্রহ'-এর ভাষাকে "প্রাচীন অপভ্রংশ"/"বৌদ্ধ প্রাকৃত ভাষা" বলে দাবি করলে শাস্ত্রী "বাস্ড়বিক প্রাকৃত অপভ্রংশ পালি প্রভৃতি শব্দের কোন নির্দিষ্ট অর্থ নাই" বলে তা নাকচ করে দেন (হরপ্রসাদ, ১৯১৬ : ৫)।

চর্যা ও সমজাতীয় কয়েকটি পুথির ভাষাকে "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষা" বলে মনে করেছেন শাস্ত্রী। এটি মূলত ভাষার গোষ্ঠীগত বিবেচনা। পাশাপাশি শাস্ত্রী এ-রচনার ভাষার একটি বিশেষ রূপের কথাও বলেছেন, তাঁর বর্ণনায় যা "সন্ধ্যা ভাষা"। তাঁর সংজ্ঞার্থে এটি "... আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলোক, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উচু অঙ্গের ধর্ম্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আসে" (হরপ্রসাদ, ১৯১৬ : ৮)। শাস্ত্রী আরও উলে-খ করেন যে, "সহজিয়া ধর্ম্মের সকল বইই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা"।

চর্যাপদ একই সঙ্গে "বাঙ্গালা" এবং "সন্ধ্যাভাষা"য় রচিত বলে শাস্ত্রীর যে দাবি, তা থেকে স্পষ্ট যে তিনি সন্ধ্যাভাষাকে আর্য ভাষাগোষ্ঠীর কোনো শাখারূপ বলে মনে করেন নি। তবে চর্যাপদ প্রকাশের ৮ বছর পর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত *Visvabharati Quarterly* (১৯২৪)-তে প্রকাশিত প্রবন্ধে জানান যে,

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চল ও সাঁওতাল পরগনা নিয়ে গঠিত দক্ষিণ-পূর্ব ভাগলপুরের নাম ছিল "sandhya country" (Rabindranath, 1924 : 265)। তাঁর বর্ণনায় এটি প্রাচীন আর্যাবর্ত ও বঙ্গের সীমান্ড়বর্তী অঞ্চল। বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন যে, যারা এ-অঞ্চলে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রায় একই রকমের উপভাষার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা নির্দ্বিধায় বুঝতে পারবেন সিদ্ধাদের ভাষা সন্ধ্যাদেশের ভাষার নিকট-সম্পর্কিত।

এর ৪ বছর পরে বিধুশেখর শাস্ত্রী *প্রবাসী* (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বলেন যে, নেপালে অনেক পুথিতে লিপিকরের ভুলে "সন্ধ্যাভাষা"র উলে-খ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এটি হবে "সন্ধাভাষা" — "এই সমস্ড় স্থলে সন্ধ্যার (অর্থাৎ সন্ধ্যাকালের) কোনো সম্বন্ধ নাই" (বিধুশেখর, ১৩৩৫)। তাঁর দাবির সমর্থনে বিধুশেখর 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ড়রীক'-এর ফরাসি, ইংরেজি, চৈনিক ও জর্মন অনুবাদের সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন। বুর্নুফ সন্ধার ফরাসি অনুবাদে (১৮৫২) এর অর্থ করেছেন enigmatique language বা "প্রহেলিকাময় বাক্যালাপ" এবং "প্রহেলিকারূপ প্রকাশিত চিন্ড়র ব্যাখ্যা" কার্ন-এর ইংরেজি অর্থ করেছেন "রহস্য"। চিনা অনুবাদের সাহায্যে কৃত মোক্ষমূলারের প্রদত্ত অর্থ "প্রচ্ছন্ন উক্তি"। শাস্ত্রী আরও দাবি করেছেন যে, তিব্বতি অনুবাদে এটি "দ গোঙ সনম্" যার অর্থ "উদ্দেশ্য করিয়া"। শাস্ত্রীর মতে, সন্ধাভাষা মানে "অভিপ্রায়িক ও নেয়ার্থ বচন" এবং বেদপন্থিদের "অভিসন্ধার" সঙ্গে এটি অভিন্ন।

এর পরবর্তী কয়েক বছরে (১৯৩০-৩৪) প্রবোধচন্দ্র বাগচী *Indian Historical Quarterly* ও *Calcutta Oriental Journal*-এ এ-বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন। তিনি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, আনুমানিক ৭ম-৮ম শতকে রচিত *হেবজ্রতন্ত্র*-র একাদশ শতকের চিনা-অনুবাদে সন্ধাভাষার ওপর একটি পৃথক অধ্যায় রয়েছে। তিব্বটি অনুবাদ ও বিভিন্ন পুথিতেও এর পাঠান্ড়র পাওয়া গেছে। এর বিশে-ষণ করে বাগচী মনে করেন যে, সন্ধাভাষা একটি "symbolical language ... to signify something different from what is expressed by the words (Prabodh, 1975 : 27-28)। *হেবজ্রতন্ত্রের* ত্রয়োদশ অধ্যায় অনুসারে সন্ধাভাষা "মহাভাষাম্" যাতে নানা মতবাদের অর্থ প্রকটিত (সময়-সংকেত বিস্ড়রম্)।

আলেক্স ওয়েম্যান *The Buddhist Tantras* (১৯৭৩) গ্রন্থে সন্ধাভাষা সম্পর্কে বিধুশেখর শাস্ত্রী ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীসহ বিভিন্ন পণ্ডিতের মত পুনর্বিবেচনা করেছেন। প্রদীপাদ্দৎতনের বিহারে প্রাপ্ত চন্দ্রকীর্তির পাণ্ডুলিপির নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দিয়েছেন ওয়েম্যান: "বিশিষ্টরুচি সত্বানাং ধর্মতত্ত্ব প্রকাশং/বিরুদ্ধালাপযোগেন যত তত সন্ধ্যাভাষিতম্"। ওয়েম্যান এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : দ্ব্যর্থক বক্তব্যের প্রক্রিয়ায় যখন উন্নততর অনুভূতিসম্পন্ন সংবেদী সত্তা কোনো প্রাকৃতিক সত্যকে উদ্ঘাটন করে, তা সন্ধ্যাভাষার রীতিতে ব্যক্ত হয় (Alex, 2005 : 129)।

'গুহ্যসমাজ'-এর টীকাগ্রন্থ *জ্ঞানবজ্রসমুচ্চয়*-এ ৎসোন-খা-পা (Tson-kha-pa, ১৩৪৪-১৪১৯) সন্ধ্যাভাষা সম্পর্কে অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, "অর্থের বিকল্পে ব্যবহৃত হয় নেয় ও নীত; শব্দের বিকল্পে সন্ধ্যা"। ওয়েম্যান মনে করেন যে, এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে সন্ধাভাষার সঙ্গে গুহ্যার্থের সম্পর্ক টেকে না। ৎসোন-খা-পা-এর মতে, যাঁদের মনে সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভের মতো সূক্ষ্ম চেতনা ও প্রগাঢ় ভাবাবেগ বিদ্যমান, তাঁদের জন্যই দ্ব্যর্থক বক্তব্যের সন্ধাভাষা। ওয়েম্যানের বিবেচনা অনুসারে এই মত গ্রহণ করলেও "অভিপ্রায়িক" বা "গোপন" অর্থে সন্ধ্যার ব্যবহার সিদ্ধ নয় (Alex, 2005 : 129)।

চন্দ্রকীর্তি ও ৎসোন-খা-পা-র মন্তব্য অনুধাবন করে ওয়েম্যানের মতে, সন্ধাভাষার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকৃত অর্থই ঠিক। আলো এবং অন্ধকারের মাঝে যে "ambiguity, contradiction, or paradox" তাই সন্ধাভাষার বৈশিষ্ট্য। তাঁর মতে, বৌদ্ধচেতনায় সন্ধ্যাকাল বিশেষ তাৎপর্যবহ এবং এ-সময়ের জন্য বিশেষ শব্দমালার ব্যবহার আশ্চর্যের কিছু নয় (Alex, 2005 : 130)।

সুকুমার সেন (১৯৫৬) মুনিদত্তের টীকায় অন্তত পাঁচটি স্থানে সন্ধ্যার উল্লেখ সনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে : সন্ধ্যাভাষম, সন্ধ্যাভাষান্তর, সন্ধ্যাভাষয়া, সন্ধ্যাবচনেন, সন্ধ্যাসঙ্কেত, সন্ধ্যয়া প্রভৃতি। সেন মনে করেন যে, শব্দটি "সম্ + ধ্যৈ" বা "সম্ + ধা" যোগে গঠিত এবং এর অর্থ "অনুধ্যান করিয়া অথবা মর্মজ্ঞ হইয়া বুঝিতে হয়" (সুকুমার, ১৯৯৫ : ৩২-৩৩) এবং ভাষায় ও শব্দে যার অর্থ বিশেষভাবে নিহিত থাকে। সেনের মতে, শাস্ত্রী কথিত দিবারাত্রির মোহনার সঙ্গে সন্ধ্যাভাষার কোনো সম্পর্ক নাই।

তারাপদ মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে, চর্যায় অর্থের দ্ব্যর্থকতার কারণে অনেকের বিবেচনায় এটি বিশেষ 'strange language'-এ রচিত, যা সন্ধ্যাভাষা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। তাঁর বিবেচনায় এটি কোনো বিশেষ ভাষা নয়, বরং "... a style of composition in which incompatible statement is the main characteristics" (Tarapada, 1963 : 12-16)। মুখোপাধ্যায় পরে আরও পরিষ্কার করে বলেন যে, সন্ধ্যাভাষা "যোগীদের বাচনিক সংকেত" (তারাপদ, ১৩৮৫ : ৫০) এবং বজ্রকুলগোষ্ঠী-বহির্ভূত সাধারণের কাছে যাতে তাদের আলাপ বোধগম্য না হয়, সে লক্ষ্যে এ-ভাষার ব্যবহার যোগী-যোগিনীদের জন্য আবশ্যক ছিল (Tarapada, 1963 : 12-16)।

তারাপদ মুখোপাধ্যায় লক্ষ করেন যে, *হেবজ্রতন্ত্র*-এ সন্ধাভাষার ওপর অধ্যায় থাকলেও এর সংজ্ঞার্থ নেই। বজ্রগর্ভের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান "মহাসময়ং" সন্ধাভাষার যে-রহস্য বিশদ করে বললেন, তাতে শুধু বহু সংখ্যক শব্দের তালিকা ও অর্থ আছে। সন্ধাভাষা নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের মত বিশ্লেষণ করে মুখোপাধ্যায় মার্সিয়া ইলিয়াদের *Le Yoga* ... (১৯৫৪) গ্রন্থের সংজ্ঞার্থকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন। ইলিয়াদের মতে, এ ভাষা "intentional, ... secret, obscene ... with a double meaning" এবং তাতে "... a particular state of consciousness is expressed in erotical terminology, the mythological and cosmological vocabulary"। ইলিয়াদ আরও মনে করেন যে, এগুলো হঠযোগ ও যৌন-অনুষঙ্গের সঙ্গেও সম্পর্কিত (তারাপদ, ১৩৮৫ : ১২)।

লিপিপ্রমাদবশত "সন্ধা" "সন্ধ্যায়" পর্যবসিত হয়েছে — নির্মল দাশগুপ্ত এমন তত্ত্ব মানতে রাজি নন। তাঁর মতে, *হেবজ্রতন্ত্র*সহ সমকালীন পুথিতে য-ফলাযুক্ত রূপেই শব্দটি পাওয়া যায়। সন্ধ্যার নতুন ব্যুৎপত্তি 'সম্ + ধ্যৈ' প্রস্তাব করে তিনি এর সংজ্ঞার্থ দেন, "যে ভাষার অভীষ্ট অর্থ সম্যক ধ্যান" (নির্মল, ২০১০ : ৪৪)।

মনিয়ের উইলিয়াম্সের 'সংস্কৃত-বাংলা অভিধানে'র সূত্র ধরে অলিভা দাক্ষী দেখিয়েছেন যে, ব্যুৎপত্তিগত বিবেচনায় সন্ধ্যা ও সন্ধা দুটি শব্দই "মিলন" ও 'সংযোগ" অর্থে প্রযোজ্য এবং এই ভাষা "বৌদ্ধতন্ত্র সাধনার গোপনীয় এক ধরনের বচন-সংকেত" (অলিভা, ২০১১ : ৩৩-৩৪)। এসব আলোচনা, তথ্য ও যুক্তি থেকে স্পষ্ট যে, সন্ধা/সন্ধ্যাভাষা বিশেষ কোনো অঞ্চলের ভাষা নয়।

বিস্ময়ের বিষয়, মুনিদত্ত ৫০টি চর্যার বিশদ টীকা তৈরি করলেও এর ভাষা সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত দেননি। তারাপদ মুখোপাধ্যায় লক্ষ করেছিলেন যে, প্রথম চর্যার ব্যাখ্যাতেই মুনিদত্ত "প্রাকৃত] ভাসয়া রচয়িতুমাহ্" (Tarapada, 1963 : 1) শীর্ষক বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, 'সুভাষিত-সংগ্রহ'-এর ভাষা প্রসঙ্গে শাস্ত্রী প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ কোনো সুনির্দিষ্ট ভাষা নির্দেশ করে, এমন মত মানেননি। মৃণাল নাথ দাবি করেছেন যে "এককালে সংস্কৃতেতর ভাষাকে প্রাকৃত ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃতজনের ভাষা বলা হত" (মৃণাল, ২০১১ : ৪০)। এসব বিবেচনায় মুনিদত্ত উল্লিখিত প্রাকৃত মার্কণ্ডেয় বৈয়াকরণ বা দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে' উল্লিখিত প্রাকৃত নয়।

পুথি খুঁজে পাওয়ার ১০ বছর পরে *Calcutta Review*-এর (১৯১৭) নিবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছিলেন যে, তিনি চর্যার পুথিটি দেখামাত্র পরমানন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল "It was Bengali on the face of it" (নীলরতন, ২০০১ : ১৭৯)। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৭ সালের পর থেকেই শাস্ত্রীর এ-ধরনের মন্তব্য পণ্ডিতমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিস্ময়ের বিষয়, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*-এর অন্তত দুটি সংস্করণ ১৯১৬ সালের পরে ও দীনেশচন্দ্র সেনের জীবিতকালে প্রকাশিত হলেও চর্যাপদকে সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করেননি। তবে *History of Bengali Language and Literature*-এর প্রথম (১৯১১) সংস্করণে দীনেশচন্দ্র সেন চর্যাকে দশম ও একাদশ শতকের "very old form of Bengali" (Dinesh, 1911 : 5) বলে মন্তব্য করেন। সেনের মতে, এ-পর্বে বৌদ্ধরা বাংলাকে একটি লিখিত ভাষার রূপে উন্নীত করেছিল; হিন্দু-রাজত্বের পুনরাবির্ভাবের কারণে যা অকস্মাৎ থেমে যায়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত একই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৫৪) দীনেশচন্দ্র সেন মত দেন যে, চর্যা বাংলা ভাষায় রচিত, এটি আংশিকভাবে প্রতিপাদিত (partial

justification) এবং "Far from convincing" ও "open to serious objection" (Dinesh, 1954 : 51)।

বৃহৎ বঙ্গ-এর দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৩৫) দীনেশচন্দ্র সেন অনেকাংশে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতকে সমর্থন করেন। দোহার ভাষায় "বাঙ্গালা-ভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য পাওয়া" গেলেও সেনের মতে "ইহাদের সঙ্গে হিন্দীর সাদৃশ্যই বেশী"। সেনের পর্যবেক্ষণে শাস্ত্রী যে-সকল শব্দকে বাংলা বলে শনাক্ত করেছেন "তাহা পার্শ্ববর্তী প্রাদেশিক ভাষাগুলোতেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় "এবং "অপরাপর লক্ষণ অনুধাবন করিলে ঐ সকল দোহা ও গানের ভাষা হিন্দী প্রভৃতি ভাষারই নিকটতর বলিয়া মনে হয়"। কয়েকজন লেখকের বাসস্থান বঙ্গদেশে একথা মেনে নিলেও সেন শাস্ত্রীর পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, "তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে সেই সেই লেখক বঙ্গভাষায় দোঁহা লিখিয়াছিলেন"। সেন স্বীকার করেন যে, কাহ্নপার ভাষায় "মাঝে মাঝে বাঙ্গলার লক্ষণ একটু একটু দৃষ্ট হয়"; তথাপি "উহা বাঙ্গালা ভাষারই আদিরূপ বলিয়া নিঃসন্দেহে গৃহীত" হবার জন্য যথেষ্ট নয়। দীনেশচন্দ্র সেন জোর দিয়ে দাবি করেন যে, "দোঁহাকারেরা যে ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা আদৌ বাঙ্গালা নহে"। (দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৩ : ৯৬২)। এখানে লক্ষণীয় যে, সেন *বৃহৎ বঙ্গ*-এর এই আলোচনায় একবারও চর্যাপদের বিষয়টি পৃথকভাবে উলে-খ করেননি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পর্কে নানা প্রশংসামূলক মন্ড়ব্য করলেও চর্যাপদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো মন্ড়ব্য পাওয়া যায় না। সুকুমার সেন এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে *The Oxford Book of Bengali Verse*-এ রবীন্দ্রনাথ চর্যাকে স্থান দিতে রাজি হননি; তবে সেটি ভাষা সংক্রান্ড় বিতর্কের কারণে নয়, চর্যায় কাব্যগুণের অনুপস্থিতির কারণে (অতনুশাসন, ২০১২ : ১১০)। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত *বাংলা কাব্যপরিচয়*-এও (১৯৩৭) চর্যাপদ স্থান পায়নি।

চয্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়-এর দীর্ঘ মুখবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যার ভাষা-নিরূপণে তাঁর বিচারপদ্ধতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি প্রথমে কর্দিয়ে (P. Cordier) কৃত তেঙ্গুরের বা তান্জুরের ১০৮-১৭৯ সংখ্যক বান্ডিলসমূহের সূচিতে যাঁদের পরিচয় বাঙালি বা বাংলাদেশের অধিবাসী, তাঁদের ভাষাকে "খাঁটী বাঙ্গালা" বলে "নিশ্চয়" করে নিয়েছেন। এরপর তাঁদের ব্যবহৃত ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান তৈরি করে সে মাপকাঠিতে প্রতিটি চর্যার ভাষা বিবেচনা করে বাংলা/অবাংলা নির্ণয় করেছেন। শাস্ত্রী তাঁর তালিকা অনুযায়ী ২১ জন চর্যাকারের ৪৬½ টি চর্যার প্রতিটির শব্দসূচি তৈরি করে শব্দসমূহকে অবিকল সংস্কৃত(তৎসম), বিকৃত বা পরিবর্তিত সংস্কৃত (অর্ধ তৎসম?), সংস্কৃত হতে উৎপন্ন (তদ্ভব), প্রাকৃত, প্রাচীন বাংলা ও চলিত বাংলা — এই ৬টি বর্গে বিভক্ত করেছেন। পাশাপাশি ভাষার কারক, বিভক্তি, বচন, পুরুষ, পদ প্রভৃতি ব্যবহারের রীতিও বিশে-ষণ করেছেন। সার্বিক বিশে-ষণের পর শাস্ত্রী ২১ জন চর্যাকারের রচনাকেই বাংলা বলে দাবি করেছেন। অবশ্য, অন্ড়ত তিনজন রচয়িতার

ভাষায় বাংলার বাইরের প্রভাবের ইঙ্গিতও শাস্ত্রীর বিশে-ষণে আছে। তিনি উলে-খ করেছেন যে, ভুসুকুর রচনায় মাগধির অধিকরণ, শান্ড়ির রচনায় মৈথিলি "বোলতির" ব্যবহার এবং কুক্কুরির রচনায় "ল" স্থলে উড়িয়া "ড়" ও "ভনথি" পাওয়া যায়। অন্যত্র শাস্ত্রী বলেছেন যে, "একজন পদকর্ত্তার বাড়ী উড়িষ্যা দেশে, তাহার গানটিও উড়িয়া ভাষায় লিখিত" (হরপ্রসাদ, ১৯১৬ : ১৮)।

চর্যাপদের চার বছর পরে প্রকাশিত বাংলা ভাষার প্রথম স্বতন্ত্র ইতিবৃত্ত *History of Bengali Language* (১৯২০)-এ বিজয়চন্দ্র মজুমদার কিছু চর্যায় "Bengali predominates" বলে স্বীকার করলেও কার্যত তিনি শাস্ত্রীর দাবিকে নাকচ করে দেন। মজুমদারের মতে, ছন্দগঠন ও ব্যাকরণ বিবেচনায় বেশ কিছু চর্যা হিন্দিতে রচিত বলা যায়। গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে নানা বিশে-ষণের পর তিনি এই সিদ্ধান্ড়ে উপনীত হন যে নানা ভাষার "effusion", বিচিত্র শব্দের "jumble", ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন কালে ব্যবহৃত ব্যাকরণিক রূপ — এসব মিলে চর্যার ভাষাকে কোনো নির্দিষ্ট "dialect"-এর অন্ড়র্ভুক্ত করা দুষ্কর (Bijoy, 1920 : 242)।

বিশ শতকের বিশের দশকেই (১৩৩২-৩৩) বিজয়চন্দ্র মজুমদার *বঙ্গবাসী*-তে চর্যার ভাষা নিয়ে পাঁচটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর বিবেচনায় সার্বিক ব্যাকরণগত বিশেষত্ব দিয়ে বিচার না করে "গোটাকতক শব্দ দেখিয়া" বিচার করায় শাস্ত্রী "প্রতিপদে ভুল" করেছেন। মজুমদারের ধারণা, পুথিতে লিপিবদ্ধ হওয়ার আগে চর্যার গানগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে সঙ্গীতকারদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল এবং ঐ পর্বে "কোন কোন প্রাদেশিক ভাষা অল্পাধিক পরিমাণে উহাতে জড়াইয়া গিয়াছিল"। তাঁর অভিযোগ, শাস্ত্রী চর্যার ভাষা-বিচারের সময় প্রাচীন প্রাকৃত ও অপভ্রংশের দাবি বিবেচনা করেননি এবং "নেপালী, মৈথিলী, ওড়িয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার কোন প্রাদুর্ভাব আছে কিনা" তাও "বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই" (অতনুশাসন, ২০১২ : ৪২-৬৭)।

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের অবলোকনে চর্যা চৌপদী বা চোপাই ছন্দে রচিত; এ-ছন্দ হিন্দি কবিতায় বহুল পরিচিত, কিন্তু বাংলায় "সম্পূর্ণ অজ্ঞাত"। তাঁর রায় অনুযায়ী, "লুইসহ" আরও কয়েকজনের ভাষা হিন্দিবহুল। মজুমদার নিশ্চিত যে, কাহ্নু এবং সরহের ভাষা "বাঙ্গালা" নয়। উপরন্তু, "যাহা কেবল উড়িয়া ভাষার বিশেষত্ব, তাহা কাহ্নর রচনায় বহু স্থানে আছে"। চর্যায় "ওড়িয়ার প্রাদেশিকতার প্রভাব" সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মজুমদার দাবি করেন যে, চর্যার সমধর্মী "ওড়িয়া-লরিয়া কথা" এখনও লরিয়া-হিন্দিদের নিকটতম প্রতিবেশী সম্বলপুরে প্রচলিত এবং শবররা ঐ অঞ্চলের পর্বতবাসী। মজুমদার স্বীকার করেন যে, কিছু গানে বাংলা ভাষার প্রভাব আছে, তবে "ঐ ভাষাকে বাঙ্গালা বলা চলে না" (অতনুশাসন, ২০১২ : ৪২-৬৭)।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাপদের ভাষা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি নিয়ে ১৯১৯ সালে। পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার (১৯১৯-২১) ফল *The Origin*

and Development of the Bengali Language (১৯২৬) শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হলে চর্যার বাংলাত্বের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। চর্যার ভাষাতাত্ত্বিক, শব্দতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণিক রূপ বিশে-ষণ করে সুনীতিকুমার প্রমাণ করেন যে, চর্যার ভাষা "genuine vernacular of Bengal at its base" (Suniti, 2002 : 125) । তিনি মনে করেন যে, চর্যাপদ বাংলা বুলির (Bengali speech) প্রথম সাহিত্যিক প্রয়াস এবং প্রথম প্রয়াসে অনির্দিষ্ট স্বরূপের অনিশ্চয়তা বোধ থেকে তা কখনো কখনো সুপ্রতিষ্ঠিত পূর্ববর্তী ভাষাসমূহ থেকে ঋণ নিয়েছে। চট্টোপাধ্যায় এ-সকল পূর্ববর্তী ভাষার মধ্যে গুজরাট থেকে বঙ্গ পর্যন্ড় সাহিত্যিক বাহনরূপে শৌরসেনী অপ্রভ্রংশের প্রভাব মেনে নিয়ে বলেন যে, মাগধি-অপভ্রংশ প্রভাবিত অঞ্চলেও সাহিত্যের ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব ছিল এবং চর্যাকারও সে প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। কিছু চর্যায় পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার ছাপ স্পষ্ট বলেও তিনি দাবি করেন। তবে তাঁর মতে, *বৌদ্ধগান ও দোহা* গ্রন্থের অন্ড়র্ভুক্ত সরোহবজ্র ও কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ পূর্বী অপভ্রংশে ও 'ডাকার্ণব' পশ্চিমী অপভ্রংশে রচিত — এগুলোর ভাষা বাংলা নয় (Suniti, 2002 : III)।

বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (১৯২৯) ও পরবর্তী অন্যান্য রচনায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত পুনর্ব্যক্ত করেন। চর্যার ভাষাকে তিনি "প্রাচীন বাঙ্গালা" রূপে নির্দেশ করে ব্যাখ্যা দেন যে, পশ্চিমা অপভ্রংশের "কিছু রূপ" বা "দু'চারটে রূপ এসে" যাওয়ার ফলে "এর ভাষার 'বাঙলাত্ব' চলে যায় না" (সুনীতিকুমার, ১৯৩৪ : ১২২)। চট্টোপাধ্যায় তাঁর মতের পক্ষে 'সনৎকুমারচরিতম্'-এর জর্মন সম্পাদক হেরমান য়াকোবি কর্তৃক চর্যাকে "প্রাচীন বাঙ্গালা" দাবির বরাত দেন।

মুহম্মদ শহীদুল-াহ্ কাহ্ন ও সরহের চর্যার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব বিশে-ষণ করেন ফরাসি ভাষায় ডি.লিট. অভিসন্দর্ভ *Les Chants Mystiques de Kanha et Saraha*-এ (প্যারিস, ১৯২৮)। চর্যার ভাষা নিয়ে তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে বহু সংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করেন। মূলত *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* (১৩২৭, ১৩৪৮), *শনিবারের চিঠি* (১৩৫১, ১৩৫৪) ও *সাহিত্য পত্রিকা* (১৩৬৪, ১৩৭০)-য় প্রকাশিত এসব প্রবন্ধে তিনি চর্যাকার-জীবনী ও চর্যার পাঠ-সংশোধনের পাশাপাশি চর্যার ভাষা নিয়ে বিস্ড়ৃত আলোচনা করেন। পরে একটি দীর্ঘ সম্পূরক প্রবন্ধসহ এই আলোচনার মূল অংশগুলো *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খ-ের (১৯৫৩) অন্ড়র্ভুক্ত হয়। এসব নিবন্ধে শহীদুল-াহ্ দাবি করেন যে, কানুপার চর্যাকে "ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে ... প্রাচীন বাংলা বলতেই হবে"; "শবরীপা যে দুইটি গান লিখেছেন, তা যে প্রাচীন বাংলা ভাষায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই"; লুইয়ের গানের অনেক শব্দ "পুরাতন বাংলার"; বিরূপার চর্যায় "প্রাচীন বাংলার লক্ষণ আছে"; ডোম্বীপার চর্যা "পুরানো বাঙ্গালার"; ভুসুকু "প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় পদ রচনা" করেছিলেন; কুক্কুরী, কম্বলাম্বর, কঙ্কণ, ধর্ম্ম, ভদ্র, বীণা, দারিক, গু-ঁরী, চাটিল-, ঢেণ্ঢন ও তাড়কের ভাষা "প্রাচীন বাঙ্গালা"। তবে শহীদুল-াহ্ও অনেক ক্ষেত্রে স্বীকার করেছেন যে, "সেকালের বাঙ্গালা আসামী ও

উড়িয়া হইতে সামান্যই পৃথক্ ছিল" (শহীদুল-াহ্, ১৯৫৩ : ২৩, ৪৩, ৪৬, ৫১, ৬৫-৭০)।

অন্ড়ত পাঁচজন চর্যাকারের ভাষাকে মুহম্মদ শহীদুল-াহ্ বাংলা বলে দাবি করেননি। আর্যদেবের ভাষাকে তিনি "অনেকটা বাঙ্গালা বটে" বললেও চূড়ান্ড়বিচারে "উড়িয়া ভাষা বলাই সঙ্গত" বলে মন্ড়ব্য করেছেন। মহীধর ও শান্ড়ির চর্যার ভাষাকে তিনি মৈথিলি বলে মেনে নিয়েছেন। জয়নন্দীর ভাষার মধ্যে তিনি "গৌড়ী অপভ্রংশের পরবর্তী আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষার প্রাচীন রূপ" খুঁজে পেয়েও তাঁর ভাষাকে "প্রাচীন বাঙ্গালা বলিতে আপত্তি" করেননি; তবে স্বীকার করেছেন যে, "এই ভাষা মৈথিলী, উড়িষা, বাঙ্গালা ও আসামীতে একরূপ"। সরহের ভাষার ওপর কামরূপী/আসামীর প্রভাব স্বীকার করতে গিয়েও দ্বিধান্বিত সিদ্ধান্ড় দিয়েছেন, "তাহার ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা"; এবং পরক্ষণেই মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, "ওই সময় প্রাচীন আসামী ও প্রাচীন বাঙ্গালা একই রূপ ছিল" (শহীদুল-াহ্, ১৯৫৩ : ৬৭-৬৯)।

Buddhist Mystic Songs-এর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬৬) মুহম্মদ শহীদুল-াহ্ চর্যাপদের ব্যাকরণ ও শব্দ নিয়ে আবার আলোকপাত করেন। এখানেও শান্ড়ির ভাষাকে বিহারি (মৈথিলি) স্বীকার করে বাকিদের ভাষাকে বাংলাই বলেছেন। কুক্কুরির ভাষায় মৈথিলির লক্ষণ "ভনথি"কে তিনি লিপিকর-প্রমাদ মনে করেন। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, উড়িয়া, বাংলা ও আসামী — তিন ভাষাতেই অতীতকালের জন্য ইল এবং ভবিষ্যতের জন্য ইব যুক্ত হয় এবং মধ্যযুগে (medieval period) বাংলা ও আসামী "common language" ছিল (Shahidullah, 1966 : XIX-XXI)। গ্রন্থের নামকরণেও তিনি একে "oldest Bengali and other eastern varnaculars বলে উলে-খ করেন।

চর্যার ভাষা সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল-াহ্র মতের সারাৎসার পাওয়া যায় 'বৌদ্ধগানের ভাষা' (১৩৬৪) প্রবন্ধে। ভাষা-সংক্রান্ড় বিভ্রান্ড়ির প্রেক্ষাপট বিশে-ষণ করে তাঁর মনে হয়েছে যে, চর্যাকাররা বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সময়ের লোক; "সুতরাং সকলের ভাষা যে একরূপ হইতে পারে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ"। চর্যার ভাষাকে একইসঙ্গে মৈথিলি, ওড়িয়া, বাংলা, আসামি ভাষার দাবির কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, এ সকল ভাষা "প্রাচ্য ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর নব্য ভারতীয় আর্যভাষাভেদ" এবং "এক গোষ্ঠীজাত ভাষা হিসাবে ইহাদের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ আছে"। এমনকি "মূলে আদিম প্রাকৃত (proto-Prakrit) হইতে উৎপন্ন বলিয়া হিন্দী ইত্যাদি অন্য গোষ্ঠীজাত নব্য ভারতীয় আর্য ভাষারও সহিত ইহাদের কিছু সাদৃশ্য থাকিতে পারে" (হাই, ১৩৬৪)।

চর্যাপদ প্রকাশের প্রথম অর্ধশতকে বিভিন্ন ভাষার দাবিসমূহও শহীদুল-াহ্ এই প্রবন্ধে পর্যালোচনা করেন। তিনি নানা যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন যে, বৌদ্ধগানের ভাষাকে কৃত্রিম, মিশ্রিত বা খিচুড়ি ভাষা বলা "ভাষাতত্ত্ব বিরোধী"। সপ্তমী বিভক্তির সাযুজ্য ছাড়া অপভ্রংশের অন্যান্য লক্ষণ চর্যায় নেই। প্রাচ্যগোষ্ঠীর হিন্দি ভাষার সঙ্গে কিছু শব্দগত

মিল থাকলেও হিন্দি "নব্য ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যগোষ্ঠীর (central group) অন্ড়র্গত বিধায় চর্যার ভাষা হিন্দি হতে পারে না। শান্ড়ি ব্যতীত আর কারও ভাষায় মৈথিলির বা আর্যদেব ব্যতীত আর কারও ভাষায় উড়িয়ার বিশিষ্ট লক্ষণ নেই। বাংলা ও আসামির সাধারণ লক্ষণের বাইরে "আসামীর লক্ষণ"ও চর্যাপদে দেখা যায় না।

প্রবন্ধের শেষাংশে শহীদুল-াহ্ চর্যার ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের ভাষা বলে সুনীতিকুমারের দাবিকে নাকচ করে দিয়ে বলেন যে, চর্যার অনেক শব্দ বরং "পূর্ববঙ্গে কিছু পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিতরূপে এখনও কথ্য ভাষায় প্রচলিত আছে"। চূড়ান্ড় বিচারে শহীদুল-াহ্র সিদ্ধান্ড়, চর্যাপদের ভাষাকে "প্রাচীন বাঙ্গালা কিংবা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রাচীন বঙ্গ-কামরূপী ভাষা বলাই সঙ্গত মনে করি"।

সুকুমার সেন *চর্যাগীতি পদাবলী* (১৯৫৬, ১৯৬৬, ১৯৯৫)-তে চর্যার ভাষা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় জানান যে, পদ, ইডিয়ম ও প্রবচন বিবেচনায় "চর্যাগীতির ভাষাও যে বাঙ্গালাই তাহা বোঝা যায়"। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যার যেসব শব্দ ও পদকে শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবজাত বলে চিহ্নিত করেছেন, সুকুমার সেনের ভাষায় "সেগুলি সূক্ষ্মবিচারে অবহট্ঠের"। সেন দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর সঙ্গে যুক্ত করেন, "চর্যাগীতির সঙ্গে [সরহ ও কাহ্নের দোহা] মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে অবহট্ঠের সঙ্গে চর্যাগীতির ভাষার সম্বন্ধ কত নিকট"। সেন চর্যার ভাষার ওপর অসমিয়াভাষীদের দাবির যৌক্তিকতাও স্বীকার করেন, "কেননা ষোড়শ শতাব্দী অবধি" বাংলা ও অসমিয়ার "বিশেষ তফাৎ ছিল না।" অন্যান্য ভাষার দাবির প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সেনও অনুভব করেন যে, "নবীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্ড়রে সর্বত্র মোটামুটি একটা মিল ছিল, এবং এক আধটি শব্দ বা পদ লইয়া বিচার করিলে প্রথম স্ড়রের যে কোন ভাষাকে অপর ভাষা বলিয়া দেখানো খুব সহজ" (সুকুমার, ১৯৯৫ : ৪২-৪৩)।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৪০, ১৯৯৩) গ্রন্থে সুকুমার সেন চর্যা "উদ্ভূয়মান বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন", "প্রাচীন বাঙ্গালায় লেখা" প্রভৃতি মন্ড়ব্য করেছেন (সুকুমার, ১৯৯৩ : ৫৪-৫৫)। *A History of Bengali Literature* (১৯৬৫)-এর বাংলা সংস্করণে সুকুমার সেন সুনীতিকুমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলেন যে, চর্যার পদগুলোর ভাষা প্রধানত পশ্চিমবঙ্গীয়, তবে নানা পদে অন্যান্য উপভাষার বিশেষত্বও আছে। অন্যত্র এই গ্রন্থে সেন অবশ্য বাংলার দাবির ব্যাপারে খানিকটা নমনীয় হয়ে বলেন, "ব্যাকরণে ইডিয়মে ও শব্দবিন্যাসে বাংলা ভাষার আদল তাতে বেশ খানিকটা দেখা গিয়েছে" (সুকুমার, ২০০৭ : ১৭)। শেষ মন্ড়ব্যটি বিশে-ষণ করলে ধরে নিতে হয়, বাংলা ভাষার আদল তখনও পূর্ণ অবয়ব পায়নি; অথবা চর্যাপদে বাংলা ভাষার পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয়নি।

সুকুমার সেন চর্যার ভাষার ওপর ওড়িয়া ও অসমীয়ার দাবিকে উপেক্ষা করেননি। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, "ওড়িয়া বাঙ্গালা ও অসমীয়া এক মূল পূর্বপ্রান্ড়ীয় কথ্যভাষা

হইতে উদ্ভূত" বিধায় "বাল্যাবস্থায় তিনটি ভাষার মধ্যে মিল থাকিবেই"। সেন মেনে নেন যে, "কোন কোন বিষয় স্বতন্ত্রভাবে ধরিলে চর্যাগীতির ভাষাকে প্রাচীন ওড়িয়া বা প্রাচীন অসমীয়া বলিলেও অন্যায় হয় না"। ভাষার গোষ্ঠী বিবেচনা করে সুকুমার সেন জোর দিয়েই বলেন যে, "হিন্দীর দাবি উঠিতেই পারে না" (সুকুমার, ২০০৭ : ৫৫)।

"প্রাচীন বাঙ্গালায়" লিখিত হলেও এতে "বেশ কিছু" "অবহট্ঠের ছাপ ও ছাঁদ আছে" স্বীকার করে সেন অবহট্ঠের সঙ্গে চর্যাগীতির নিকট সম্পর্কের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু *A History of Bengali Literature*-এর বাংলা অনুবাদ *বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস* গ্রন্থে সুকুমার সেন চর্যাপদের ভাষাকে "প্রাচীন বাংলা" বলে পরক্ষণেই মন্ড়ব্য করেন, "ঠিক করে বলতে গেলে প্রাচীন বাংলার পূর্ববর্তী স্ড়র প্রত্ন বাংলায় রচিত" (সুকুমার, ২০০৭ : ১৭)। এই মন্ড়ব্যের বিশে-ষণে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, প্রাচীন বাংলার পূর্ববর্তী স্ড়রকে বাংলা ভাষার অন্ড়র্ভূত করা যাবে কি না?

প্রবোধচন্দ্র বাগচী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের *Journal of the Department of Letters* (১৯৩৮)-এ তিব্বতি অনুবাদের সাহায্যে চর্যাপদের যে পাঠ তৈরি করেন, তার শিরোনাম থেকে স্পষ্ট যে, তিনি এর ভাষাকে "Old Bengali" বলে স্বীকার করে নিয়েছেন (Prabodh, 1938)। *বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য* (১৩৫৯) গ্রন্থেও বাগচীর মত, চর্যার ভাষা "প্রাচীন বাংলা" এবং এই বাংলা দশম-একাদশ শতকের (প্রবোধ, ১৪০৪ : ৫০, ৫৬)।

চর্যার ভাষা-বিচারে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বহুলাংশে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর *Obscure Religious Cult* (১৯৪৬) গ্রন্থে আলোচনায় দাশগুপ্ত দাবি করেন যে, "the essential linguistic nature of these songs cannot but be admitted to Bengali" (Sashi, 1976 : 4)। চর্যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৈথিলি, উড়িয়া বা শৌরসেনী অপভ্রংশের যে রূপ পাওয়া যায়, দাশগুপ্ত তাকে 'sparodic introsions' বলে মন্ড়ব্য করেছেন।

বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি (১৩৬৪) গ্রন্থে অবশ্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর মনোভাব ঈষৎ পরিবর্তন করে বলেন, চর্যাপদের ভাষা দশম হতে দ্বাদশ শতকের 'বৃহত্তর গৌড়ে'র ভাষা। দাশগুপ্তের বিবেচনায় বৃহত্তর গৌড় প্রাচীন বাংলার সমার্থক এবং তাঁর সংজ্ঞার্থে এটি নিম্নব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পার হতে আরম্ভ করে উড়িষ্যার কিয়দংশ, বর্তমান বিহারের কিয়দংশ ও বর্তমান আসামের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত বৃহৎ ভূভাগ (শশিভূষণ, ১৪১৯ : ৮৩)। একই কবি কেন চর্যায় একভাষা এবং দোহায় অন্য ভাষা ব্যবহার করলেন, তারও একটি ব্যাখ্যা দেন দাশগুপ্ত।

তারাপদ মুখোপাধ্যায় যে গ্রন্থে (১৯৬৩) ইংরেজিতে চর্যাপদের বিস্ড়ৃত ব্যাকরণিক বিশে-ষণ করেন, তার শিরোনামেই জানিয়ে দেন যে, এই ভাষা 'Old Bengali' (Tarapada, 1963)। তিনি *চর্যাপদ* (১৩৭২) গ্রন্থে উলে-খ করেন যে, দীর্ঘকাল মুখে

মুখে প্রচলিত থাকার ফলে চর্যাপদের গানগুলির আদিরূপ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে এবং মুনিদত্তের ব্যাখ্যার মাধ্যমে চর্যার যে রূপ বর্তমানে প্রচলিত তা পরবর্তীকালের রূপান্ড়র; এমনকি উপভাষাগত পার্থক্যও তাতে রক্ষিত হয়নি। মুখোপাধ্যায় আরও মনে করেন যে, কবিবিশেষের ভাষাভঙ্গি পরিবর্তন করে চর্যার পদগুলোর মধ্যে একটা "uniform pattern" গড়ে তোলা হয়েছে (তারাপদ, ১৩৮৫ : ৫০-৫১)।

মুহম্মদ এনামুল হক বাংলা ভাষার "স্বকীয় রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ"-কে ৯০০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপন করে চর্যাপদকে "এ সময়ের সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন" রূপে চিহ্নিত করেন। তিনি দাবি করেন যে, "চর্যাপদের ভাষা যে বাঙলা, এখন সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই"; তবে তাতে 'বাঙলা-ভাষার প্রাথমিক অবস্থাই' প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দি ও মৈথিলির দাবিকে এনামুল হক "একান্ড়ই অযৌক্তিক" মনে করেন। উড়িয়া ও আসামি/অহমিয়া ভাষার দাবিকে "আংশিকভাবে স্বীকার করতে" তাঁর আপত্তি নেই। তাঁর বিবেচনায় মাত্র ৮০০ বছর আগে উড়িয়া এবং ৬০০ বছর আগে বাংলা থেকে পৃথক নয়। তাঁর অবলোকনে উড়িয়া ও আসামি ভাষার পরবর্তী বিকাশ "চর্যাপদের সূত্র ধরে এগোয়নি" (মনসুর, ১৯৭৪)।

আহমদ শরীফ চর্যার ভাষা সম্পর্কে তাঁর পূর্বসূরিদের মত পর্যালোচনা, বেশ কিছু মতে প্রশ্ন উত্থাপন ও খ"ন করে চর্যাপদকে "নব্যভারতীয় ভাষার স্বরূপপ্রাপ্তির পূর্বেকার রচনা" কিংবা "অর্বাচীন শৌরসেনী অবহট্‌ঠ" ভাষায় রচিত — এ ধরনের দাবিগুলোকে নাকচ করেননি। কিন্তু "প্রায় ছয় শ বছর ধরে মুখে মুখে" পরিবর্তিত হয়ে পুথিতে প্রাপ্ত চর্যাপদের শব্দ ও ব্যাকরণ "আদি বা প্রত্ন বাংলার প্রায় সদৃশ হয়ে উঠেছিল" — এমন অনুমানকে সংগতই মনে করেন তিনি। তাই তাঁর কথায় চর্যার ভাষার ওপর বাংলার দাবি "নিতান্ড় অযৌক্তিক নয়" (আনিসুজ্জামান, ২০০৮ : ৩৫৯)।

তিনজন চর্যাকারের ভাষা বাংলা নয়, এমন ইঙ্গিত দিয়ে প্রকৃতপক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই চর্যার ওপর বাংলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষাভাষীদের দাবির পথ খুলে দেন। চর্যার প্রথম ভাষা-পর্যালোচনায় (১৯২০) বিজয়চন্দ্র মজুমদার চর্যার ভাষায় হিন্দির লক্ষণ-প্রবণতার বিষয়টি যুক্ত করেন। হিন্দির এই দাবিকে যুক্তিসংগত প্রমাণে প্রথম প্রয়াসী চর্যাপ"িত রাহুল সাংকৃত্যায়ন। মৃণাল নাথের "উলে-খপঞ্জী" অনুসারে (২০১১) সাংকৃত্যায়ন হিন্দি গবেষণাপত্র *গঙ্গা*-য় (১৯৩৩) 'হিন্দীকে প্রাচীনতম কবি ঔর উনকি কবিতাএঁ' এবং 'মাগধী হিন্দী কা বিকাশ' শীর্ষক নিবন্ধদ্বয়ে চর্যাকারদের হিন্দি কবি বলে দাবি করেছেন (মৃণাল, ২০১১ : ২০৪)। এই দাবির ধারাবাহিকতা দেখা যায় রাহুল সাংকৃত্যায়নের *পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী* (১৯৩৭), *হিন্দি কাব্যধারা* (১৯৪৪) প্রভৃতি গ্রন্থে। চর্যার ভাষা সম্পর্কে সাংকৃত্যায়নের বহুল পরিচিত উক্তি : "জবতক নালন্দা, বিক্রমশীলাকো বঁগাল মেঁ নহীঁ লে জায়া জাতা, তবতক সিদ্ধোঁকী ভাষা ভী বঁগলা নহীঁ হো সকতী। রহী ভাষাকী সমানতাকী বাত রহ তো মগহী ঔর মৈথিলীসে ঔর অধিক হৈ" (অলিভা, ২০১১ : ৬০)। লক্ষণীয় যে, চর্যার অধিকাংশ কবিতাকে *হিন্দি*

কাব্যধারার অন্ড়র্ভুক্ত করলেও সাংকৃত্যায়ন "হিন্দি" না বলে এর ভাষাকে চিহ্নিত করেছেন 'মগহী" এবং "মৈথিলী" অভিধায়।

ধর্মবীর ভারতী *সিদ্ধসাহিত্য* (১৯৬৮) গ্রন্থে চর্যা ও চর্যাকার নিয়ে বিস্ড়ৃত আলোচনা করেছেন; তবে চর্যার ভাষার হিন্দিত্ব দাবি করে কোনো মত দেননি। বরং তাঁর ভাষায় রাহুল সাংকৃত্যায়ন নিজের দাবির পক্ষে "যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রস্তুত" করতে পারেননি এবং সাংকৃত্যায়ন চর্যার ভাষার "পূর্বী প্রকৃতি" ও দোহাকোষের ভাষার "পশ্চিমী প্রকৃতির" ওপর যথাযথ "ধ্যান" দেননি (ধর্মবীর, ১৯৮৮ : ২৩৪)। ভারতী উলে-খ করেছেন যে, "স্পষ্টীকরণ" করতে গিয়ে সাংকৃত্যায়ন নিজের মতকে নমনীয় করে বলেছিলেন, "অধিকাংশ পূর্বী ভাষাএঁ ইস ভাষা কী আপনা পূর্বরূপ কহ সকতী হোঁ" (ধর্মবীর, ১৯৮৮ : ২২৯)।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের অনুসরণে কাশীপ্রসাদ জয়সোয়ালসহ (১৯৩৫) যাঁরা চর্যার ভাষাকে হিন্দি (বা মাগহি) বলে দাবি করেছেন, তাঁরা এর পক্ষে নতুন কোনো যুক্তি দেননি। রামবহাল তেওয়ারি তাঁর বৃহদাকার *হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস* (১৯৮৯)-এ হিন্দি সাহিত্যের আদি নিদর্শনরূপে নবম শতকের খুমান রামো; দ্বাদশ শতকের বীমলদেব রাসো, পৃথ্বীরাজ রাসো, সন্দেশ রাসক প্রভৃতির উলে-খ করেছেন। চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, এতে সে যুগের হিন্দি, বাংলা, উড়িয়া এবং অসমিয়ার 'লক্ষণ চোখে পড়ে'; তবে তার সঙ্গে পরবর্তীকালের বাংলার "প্রবল সাদৃশ্য" আছে। তেওয়ারির মতে, চর্যার ভাষাকে "বাংলা ভাষার পূর্বরূপ বলে ... চিহ্নিত করা যেতে পারে"।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক চর্যাকে হিন্দি দাবির সারাৎসার প্রস্তুত করে নির্মল দাশ বলেন যে, মূলত তিনটি যুক্তিতে সাংকৃত্যায়নের এ দাবি — (১) চর্যা শৌরসেনী অপভ্রংশ পদবহুল, এই শৌরসেনী থেকেই হিন্দির বিকাশ; (২) হিন্দিতে বহুল প্রচলিত দোহা ছন্দে চর্যা রচিত; এবং (৩) অধিকাংশ চর্যাকার বিহারের অধিবাসী (অতনুশাসন, ২০১২ : ১০৪)। চর্যাকারদের জীবনী প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, অধিকাংশ চর্যাকারের বাস বিহারে নয়। ভাংগল, সোমপুর, সোহর, ঘহুর প্রভৃতিকে বিহারের অন্ড়র্ভুক্ত মনে করায় সাংকৃত্যায়ন এমন দাবি করেছেন। উপরন্তু, সে-কালের বিহারের অধিকাংশ মানুষ মৈথিলি বা ভোজপুরিভাষী ছিলেন — হিন্দিভাষী নন। এছাড়াও নীলরতন সেনের বিশে-ষণ অনুসারে চর্যায় চউপইআ ও দোহার তুলনায় "পাদাকুলকের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী" (নীলরতন, ১৯৭৪ : ৬৪)। ভাষা-বিতর্ক প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে একথা বলা হয়েছে যে, নব্য ভারতীয় আর্যভাষার গোষ্ঠীর বিভাজনে পূর্বী-গোষ্ঠীর শাখা নয় বলে চর্যার ওপর হিন্দির দাবিকে অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিক গ্রাহ্য করেননি।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের মাগহি/মৈথিলির দাবিকে ১৯৪০-এর দশকে পুনরায় উত্থাপন

করেন শিবনন্দন ঠাকুর তাঁর *বিদ্যাপতি কী ভাষা*-র (১৯৪১) আলোচনার পাদটীকায়। জয়কান্ড় মিশ্র তাঁর *A History of Maithili Literature* (১৯৪৯)-এ জোর দিয়েই বলেন যে, "প্রাচীন মৈথিলীর উদাহরণরূপে এই 'গান' গুলির দাবি সর্বাগ্রে"। মিশ্রের বিচারে দোহাগুলো "মূলত অপভ্রংশে লেখা" হলেও চর্যাগীতি ও ডাকার্ণব মৈথিলিতে রচিত। পরবর্তী অর্ধশতকে (১৯৭৬, ২০০২) মিশ্রের এই ইতিহাস গ্রন্থের নতুন সংস্করণ ও অনুবাদে চর্যার ভাষাকে মৈথিলি দাবির পক্ষে যে যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে তা সাত স্ড়রে বিন্যস্ড় — (১) চর্যা-রচয়িতাসহ সিদ্ধারা মগধদেশেই উদ্ভূত হয়েছেন এবং বিক্রমশালী ও নালন্দার বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; (২) সিদ্ধাদের রচনার সঙ্গে 'কীর্তিলতা', 'কীর্তিপতাকা', 'বর্ণরত্নাকর', 'বিশুদ্ধ-বিদ্যাপতি-পদাবলী' প্রভৃতির ভাষার "সাদৃশ্য...প্রচুর"; (৩) ধ্বনিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চর্যা ও মৈথিলির মধ্যে "অদ্ভুত সাম্য" রয়েছে; (৪) শব্দরূপে বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া, কারক ও লিঙ্গের ক্ষেত্রে চর্যার অনেক বৈশিষ্ট্য মৈথিলির অনুরূপ এবং চর্যায় "বেশ কিছু খাঁটি মৈথিলী শব্দ রয়েছে"। মিশ্র দাবি করেন যে, চর্যায় "মৈথিলীসুলভ বৈশিষ্ট্য...শুধুমাত্র নেপালী ও মৈথিলী লিপিকারদের দ্বারা আনীত পাঠের পরিবর্তন মাত্র নয়" (জয়কান্ড়, ২০০২ : ৩৯-৪৩)।

A History of Maithili Literature-এর প্রথম সংস্করণে (১৯৪৯) জয়কান্ড় মিশ্র স্বীকার করেন যে, "... ancient Bengali and ancient Maithili had practically no difference — so much so that works in one language could be easily mistaken for those of the other language". (Jayakanta, 1949 : 49) একইভাবে মৈথিলির সঙ্গে আসামি ও উড়িয়ার নিকট সম্পর্কও তিনি বিবৃত করেছেন। এসব বিবরণের পর গ্রন্থের বাংলা সংস্করণে (১৯৭৩) তাঁর উপসংহার — "... চর্যাপদের ভাষা বলতে চিকা-চিকি উপভাষা অঞ্চলের একটি প্রাক-মৈথিলী (Proto-Maithili) উপভাষাকেই বোঝানো হবে — যা আদর্শ বাংলা ও আদর্শ মৈথিলীর ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে — যার সঙ্গে ... মাগধী ভাষাগুলির একটা গভীর মিল রয়েছে (বিশেষ করে প্রাচীন বিশিষ্টতাগুলির ক্ষেত্রে)" (জয়কান্ড়, ২০০২ : ৪৩)।

Formation of the Maithili Langauge (১৯৫৮) গ্রন্থে সুভদ্র ঝা জয়কান্ড় মিশ্রের মতের প্রতিধ্বনি করে দাবি করেন যে, চর্যাপদই "the oldest available works written in Maithili". (Subadra, 1958 : 32)। চর্যার ব্যাকরণ ও শব্দ-ব্যবহারের সঙ্গে মৈথিলির সাযুজ্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সঙ্গে তার বৈসাদৃশ্য তুলে ধরেন তিনি। তাঁর বিবেচনায় চর্যাপদ মৈথিলির উত্তর-পূর্বী উপভাষায় রচিত এবং প্রকৃতপক্ষে তা বর্তমান চিকাচিকি অঞ্চলের "proto-maithili" উপভাষার নমুনা — যে চিকাচিকি অঞ্চল প্রমিত বাংলাভাষী ও প্রমিত মৈথিলিভাষী অঞ্চল থেকে সমদূরত্বে অবস্থিত। ঝা-র ব্যাখ্যায় এর ফলেই চর্যার ভাষার সঙ্গে মৈথিলি ও বাংলার "expected to have points of similarity and differences..." (Subadra, 1958 : 36) এবং চর্যার ভাষার ওপর বাংলার দাবিও অস্বীকার করা যাবে না।

উমেশ মিশ্রের *মৈথিলী ভাষা ঔর সাহিত্য* (১৯৫২) গ্রন্থে, জয়ধর সিংহের *বৌদ্ধগানমে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ড়* (১৯৬৯) গ্রন্থে এবং তাঁদের পূর্বসূরি নরেন্দ্রনাথ দাসের *মিথিলা-মিত্র* (১৯৩০-৩১) প্রভৃতিতে চর্যার ভাষাকে মৈথিলি দাবি করে নানা যুক্তি ও উদাহরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

মৃণাল নাথের *চর্যাপদ*-এর উলে- খপঞ্জি বিশে- ষণ করে অনুধাবন করা যায় যে, চর্যার ওপর উৎকল বা উড়িয়া ভাষার দাবি প্রথম উত্থাপিত হয় ষষ্ঠ নিখিল ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে (১৯৩০) গোপাল চন্দ্র প্রহরাজের আলোচনায়। প্রহরাজ দাবি করেন, চর্যার ভাষা-সাদৃশ বর্তমান বাংলার চেয়ে বর্তমান উড়িয়ার সঙ্গে অধিক। তবে মৃণাল নাথ জানিয়েছেন যে, এর সমর্থনে প্রহরাজ 'তেমন কোনো ভাষিক প্রমাণ' দিতে পারেননি। প্রহরাজের এ দাবিকে অগ্রসর করার প্রক্রিয়ায় *উৎকল সাহিত্য পত্রিকা* (মাঘ ১৩৩৩)-র আলোচনায় বলা হয় যে, চর্যা ওড়িয়াতেই রচিত। এর এক যুগ পরে প্রিয়রঞ্জন সেন আদি ওড়িয়া সাহিত্য সংক্রান্ড় আলোচনায় উল্টোমত পোষণ করেন। ভাষিক বিচারে সেনের মনে হয়েছে যে, "চর্যাপদ ওড়িয়ার চেয়ে বাংলার বেশি কাছাকাছি" (মৃণাল, ২০১১ : ২৯)।

পরের দশকে (১৯৫৭) আর্তবল- ভ মহান্ড়ি চর্যার সঙ্গে প্রাচীন উৎকল ভাষার সর্বাধিক সাদৃশ্যের দাবি পুনর্স্থাপন করেন। চর্যার কিছু ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য ও শব্দব্যবহারের নমুনা উপস্থাপন করে কুঞ্জবিহারী ত্রিপাঠী (১৯৬২) এবং বংশীধর মহান্ড়ি (১৯৬২) দাবি করেন যে, একমাত্র উড়িয়াতেই এগুলো পাওয়া যায়। উড়িয়ার দাবিদাররা এসব ক্ষেত্রে দ্বাদশ শতকের মাদলাপঞ্জি, ত্রয়োদশ শতকের 'রূদ্রসুধানিধি' প্রভৃতির তুলনা উপস্থিত করেন (মৃণাল, ২০১১ : ২৯-৩০)।

মায়াধর মানসিংহ তাঁর *The History of Oriya Literature* (১৯৬২) গ্রন্থে চর্যার শব্দব্যবহার, ঐতিহাসিক সম্পর্ক, সার্বিক পারিপার্শ্বিকতা ও ভাবগত প্রবহমানতা বিচার করে সিদ্ধান্ড় দিয়েছেন যে, "... in no mistaken terms ... quite a good mumber of these poems were composed in Orissa" (Mayadhar, 1962 : 22)। তবে তিনি স্বীকার করেন, বর্তমান উড়িয়া ভাষার অস্ড়িত্ব তখন ছিল না।

খগেশ্বর মহাপাত্র ওড়িয়াতে আলোচনাসহ একটি পাঠ তৈরি করেন তাঁর *চর্যাগীতিকা* (১৯৬৫)-য়। পরে চর্যার ভাষা নিয়ে বিস্ড়ৃত আলোচনা করেন *প্রত্ন-উড়িয়া : চর্যাগীতি ভিত্তিকা প্রস্ড়াবিত ব্যাকরণ* (১৯৭৯)-এ। মহাপাত্র দাবি করেন যে, চর্যার ভাষা প্রত্ন-উড়িয়া ভাষার সম্ভাবিত রূপ; কেননা বাংলা, অসমিয়া ইত্যাদির তুলনায় চর্যার ভাষারূপ উড়িয়াতে অধিক বিধৃত। অবশ্য তিনি স্বীকার করেন যে, একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষায় চর্যাপদ রচিত; কারণ চর্যা মাগধি ভাষা-পরিবারের মূল ভাষা ঔপভাষিক রূপবিকাশের সন্ধিকালীন সময়ের রচনা (অলিভা, ২০১১ : ৬১-৬২)। *চর্যাগীতিকা* (১৯৯০)-র পরবর্তী সংস্করণে খগেশ্বর মহাপাত্রের স্বীকারোক্তি, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রে বিচার না করে কেবল শব্দগত সাযুজ্য দিয়ে চর্যার ভাষাকে উড়িয়া দাবি করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। তবে তিনি মনে

করেন যে, চর্যার ভাষা উড়িয়া ভাষার নিকটবর্তী।

করুণাকর কর *আশ্চর্য্য চর্যাচয়* (১৯৮৯) গ্রন্থে চর্যা উড়িয়া ভাষায় রচিত, এমন মত দিয়েছেন; কেননা চর্যার ধর্মসাধনার মূলে যে বজ্রযান ও সহজযান, তা তাঁর মতে উড়িষ্যাতেই উদ্ভূত (অলিভা, ২০১১ : ৬২)। অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন দাশ কয়েকজন চর্যাকারকে উড়িষ্যাবাসী বললেও চর্যাকে শুধু উড়িয়া বলে দাবি করেননি। (Chittaranjan, 292)।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল-াহ্, সুকুমার সেন প্রমুখ চর্যাপদের ভাষার ওপর আসামি ভাষার দাবিকে কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁদের বিবেচনায়, চর্যা-রচনার কালে আসামি মূল বাংলা ভাষার ধারা থেকে বিযুক্ত হয়নি। কিন্তু ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *আসামিয়া সাহিত্যের চানেকি* শীর্ষক সংকলনে সম্পাদক হেমচন্দ্র গোস্বামী চর্যাকে আসামি সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেননি। তাঁর মতে, প্রাক-বৈষ্ণব যুগে কিছু বিয়ের গান, মন্ত্র ও ডাকের বচন এবং ত্রয়োদশ শতকের হেম সরস্বতী ও মাধব কন্দলির কাব্য প্রভৃতিই আসামি সাহিত্যের পুরানো নিদর্শন (হেমচন্দ্র, ১৯২৯ : LIX)।

১৯৩০-এর দশকেই কনকলাল বড়ুয়া চর্যার ভাষার ওপর "মিশ্র মৈথিলী কামরূপী" ভাষার দাবি (১৯৩৩) উত্থাপন করেন। বাণীকান্ত কাকতি *Assamese : its Formation and Development* (১৯৪১) গ্রন্থে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, চর্যার (দোহার?) কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এখনও অসমিয়া ভাষায় বর্তমান। ডিম্বেশ্বর নেওগও চর্যার সঙ্গে বর্তমান অসমিয়ার ভাষাগত ও ব্যাকরণগত সাযুজ্য (১৯৬২) দেখিয়েছেন (মৃণাল নাথ, ২০১১ : ২৮)। বিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়া *The History of Assamese Literature* (১৯৬৪)-এ চর্যার গীতিগুলো আসামি ভাষার 'formative period'-এর চিহ্ন বলে মন্তব্য করে পরক্ষণেই বলেছেন, সতর্ক নিরীক্ষায় এটা স্পষ্ট হয় যে চর্যার ভাষা মাগধি অপভ্রংশের সর্বশেষ স্তরের প্রতিনিধি। এবং এর সঙ্গে "... as such it includes to a considerable extent the earliest forms of the eastern group of modern Indo-Aryan-Language" মন্তব্যটি যুক্ত করেছেন (Birinchi, 1964 : 6)।

চর্যাকে আসামি ভাষায় রচিত প্রতিপন্ন করে বিশদ যুক্তি উপস্থাপন করেছেন পরীক্ষিত হাজরিকা তাঁর *চর্য্যাপদ* (১৯৭৩) গ্রন্থে। তিনি দাবি করেছেন যে, "বেছি ভাগ চর্য্যাপদর ভাষাই পুরাণ অসমীয়া ভাষার চানেকিতো দাভি ধরিছেই"। তাঁর মতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠে "প্রাচীন কামরূপী ভাষার বেছি ওচর চপা" এবং এই পাঠে "প্রাচীন কামরূপী ভাষার শব্দ, ব্যাকরণ আরু ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য বহু পরিমাণে রক্ষিত হৈছে"। হাজরিকার অভিযোগ, শাস্ত্রীর পাঠ-সংশোধনের নামে অনেক পণ্ডিত চর্যার শব্দ ও রূপ পরিবর্তন করেছেন এর ভাষাকে "নিজের ভাষাগন্ধী বা ভাবানুকূল" করার উদ্দেশ্যে। শুধু ভাষা নয়, পরীক্ষিত হাজরিকার দাবি, "চর্য্যার লিপিও প্রাচীন কামরূপী লিপি" (পরিক্ষীত,

১৯৯২ : ৬)।

অসমীয়া সাহিত্যের সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১)-এ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মার দাবি, তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের চর্যা সেকালে মূলত আসাম অঞ্চলেই ছিল এবং চর্যায় অসমিয়া ভাষার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। ওই দশকের শেষদিকে *A Socio-Economic and Cultural History of Medieval Asam* (১৯৮৯) গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা বলেন যে, চর্যার অনেক শব্দ, বাগধারা ও বাচনভঙ্গি সামান্য পরিবর্তিত রূপে আসামি ভাষায় এখনও বিরাজমান। তাঁর বিবেচনায় এসব গীতি হচ্ছে "... first layer of bricks on which the foundation of Assames literature is based"। কিন্তু একই সঙ্গে শর্মা যখন বলেন যে, এগুলি মাগধি ও শৌরসেনী অপভ্রংশের সর্বশেষ স্তরের প্রতিনিধি হওয়ার কারণে "... bears certain affinities with Assamese also" (নীলরতন, ২০০১ : ১৯৪-৯৫), তখন চর্যার ওপর নব্যভারতীয় আর্যভাষার পূর্বীগোষ্ঠীর সকলের অধিকারই কার্যত স্বীকার করে নেন। সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় *অসমীয়া সাহিত্য* গ্রন্থে "চৌরাশী সিদ্ধাইদের বচনকে" অসমীয়ার পূর্বরূপ কিনা সে বিষয়ে "যথেষ্ট সন্দেহের কারণ" দেখতে পান। অন্যদিকে মঞ্জু চক্রবর্তী চর্যাপদের সঙ্গে আসামি বরগীতার সাদৃশ্য উপস্থাপন করেন (১৯৯৩)।

এ-সব দাবির পাশাপাশি চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে চট্টগ্রাম, সিলেট, বরাক উপত্যকা প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার সাদৃশ্য প্রতিপাদনের প্রয়াসে নানা গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচিত হয়েছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দুজন ভাষাতত্ত্ববিদ মৃণাল নাথ ও অলিভা দাক্ষী চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে মত দিয়েছেন যে, চর্যা অবহট্‌ঠ ভাষায় লিখিত।

চর্যার সঙ্গে অবহট্‌ঠ ভাষার সম্পর্কের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত অবশ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থেই আছে। তাঁর বর্ণনা অনুসারে পূর্বাঞ্চলের কবিরা তাঁদের 'local patois' বা আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করে তৎকালীন শিষ্ট ভাষা (polite language) শৌরসেনী অপভ্রংশ ব্যবহার করতেন এবং পূর্বাঞ্চলে নব্যভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভবের পরও এই রীতি প্রচলিত ছিল। (Suniti, 2002 : 91)। চট্টোপাধ্যায় আরও উলে-খ করেছেন যে, গুজরাট-পাঞ্জাব থেকে বঙ্গ পর্যন্ত এটি যে শুধু *Lingua Franca* ছিল তা নয়; এ ভাষা ছিল "bardic speech which alone was regarded as suitable for poetry of all sorts" (Suniti, 2002 : 118).

সুকুমার সেন তাঁর *চর্যাগীতি-পদাবলী*র ভূমিকায় মন্তব্য করেন যে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যার যেসব পদ ও শব্দকে "শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবজাত বলিয়াছেন সেগুলি সূক্ষ্মবিচারে অবহট্‌ঠের"। সেন দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তখন অবহট্‌ঠই ছিল সমগ্র আর্যভাষী ভারতবর্ষের "অন্যতম সাধুভাষা"। তাঁর অবলোকনে "চর্যাগীতির সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে ... অবহট্‌ঠের সঙ্গে চর্যাগীতি-ভাষার" গভীর সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়

এবং "ছন্দ তো প্রায় একই"। সেন চর্যার ভাষার লিঙ্গরীতিকে "মোটামুটি অবহট্‌ঠের মতই" বলে রায় দিয়েছেন (সুকুমার, ১৯৫৬ : ৪০-৪১) *ভাষার ইতিবৃত্ত* (১৯৯৪) গ্রন্থে। সুকুমার সেন অবশ্য মন্তব্য করেছেন যে, সেকালে অবহট্‌ঠ ও কথ্যভাষার মধ্যে বেশি তফাৎ ছিল না। সর্বভারতীয় পাঠকদের জন্য রচিত *বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস* (১৯৬৫, ইংরেজি সংস্করণ ১৯৫৯)-এ সুকুমার সেন চর্যাগানে "অবহট্‌ঠের বেশ প্রভাব লক্ষ্য" করলেও এর ভাষাকে "প্রাচীন বাংলা" না বলে "প্রাচীন বাংলার পূর্ববর্তী স্তর প্রত্ন বাংলায় রচিত" বলে মত দেন (সুকুমার, ৪, ১৭)।

চর্যারচনার কালে পূর্ব ভারতীয় নব্য আর্য ভাষাগুলো স্বকীয় ও বিশিষ্ট সত্তা অর্জন করেনি, এমন মন্তব্যও করেছেন নীলরতন সেন, নির্মল দাশসহ অনেকে। নির্মল দাশ চর্যার ভাষাকে প্রত্ন-মগধীয় নব্যভারতীয় আর্যভাষা (Proto-Magadhan New Indo-Aryan) নামে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী (নির্মল, ২০১০ : ৩১)। তবে এক্ষেত্রে "প্রত্ন" অভিধাটির ব্যাখ্যা স্পষ্ট নয়; এর সঙ্গে "প্রাক"-এর পার্থক্য কী তাও পরিষ্কার নয়।

জাপানি-পণ্ডিত ৎসুয়োশি নারা (Tsuyoshi Naras) *Avahattha and Comparative Vocabulary of New Indo-Aryan Language* শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থে (১৯৭৯) চর্যার পদ ও শব্দের সঙ্গে সরহ, কাহ্ন, তিলোপা, পাহুড়া ও সব্যদাম্মের দোহা এবং সন্দেশ রাসক, প্রাকৃত পৈঙ্গলম ও সিদ্ধ হেম শব্দানুশাসন প্রভৃতির তুলনা করেছেন। নারার তালিকা অনুযায়ী, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, কারক, বিভক্তি, পুরুষ, কাল, প্রত্যয়, অব্যয়, বাচ্য প্রভৃতি বিবেচনায় অবহট্‌ঠ ও চর্যার ভাষার সাযুজ্য রয়েছে। যৌগিক, অনুঙ্গা, সংখ্যাবাচক ও নেতিবাচক শব্দেও তিনি মিল খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর তালিকায় এ-ধরনের পদ ও শব্দের সংখ্যা শতাধিক। অবশ্য অবশিষ্ট পদ ও শব্দ সম্পর্কে স্বভাবতই নারার মন্তব্য পাওয়া যায়নি (Tsuyoshi, 1979 : 160-63)।

মৃণাল নাথ (১৯৮৭, ২০১১) লক্ষ করেছেন যে, চর্যাপদকে যে সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলা বলে দাবি করা হয় তা "পূর্বাঞ্চলীয় অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায়ও পাওয়া যায়"। উপরন্তু "সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকাংশই অবহট্‌ঠে লভ্য"। নাথ চর্যার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাগধারা, শব্দভাণ্ডার, ছন্দ প্রভৃতি বিশে- ষণ করে দাবি করেন যে, এর সঙ্গে অবহট্‌ঠের "প্রভূত মিল রয়েছে"। মৃণাল নাথ চর্যার ভাষাকে "পূর্বী বা মাগধী অবহট্‌ঠ বলাই ... যুক্তিযুক্ত" মনে করেন। ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করেও তিনি দেখিয়েছেন যে, চর্যাপদ অবহট্‌ঠের কালেই (৬০০-১২০০ খ্রি.) রচিত এবং বাংলা-উড়িয়া-মৈথিলি-কামরূপির মাতৃস্থানীয় (মৃণাল, ২০১১ : ৩৬, ৪৩-৪৪)।

অলিভা দাক্ষীও চর্যার সঙ্গে অবহট্‌ঠের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বিস্তৃত তুলনা করে এই ভাষাকে "সাহিত্যিক সাধুভাষা অবহট্‌ঠের সঙ্গে প্রাচ্যদেশীয় লৌকিক প্রাদেশিক ভাষার

মিশ্রণ"-এ সৃষ্ট বলে মত দিয়েছেন। দাক্ষী চর্যাপদের ভাষাকে 'প্রাচ্য অবহট্‌ঠ' অভিধায় শনাক্তকরণের পক্ষপাতী। একই সঙ্গে তিনি মনে করেন যে, ওই ভাষা "ভাষাতাত্ত্বিক গঠনগত বৈশিষ্ট্যে অপরিবর্তনীয় কৃত্রিম ভাষা" এবং তৎকালীন *Lingua Franca* হিসেবে অবহট্‌ঠ চর্যায় "আরোপিত" হয়েছিল। দাক্ষীর বিবেচনায় চর্যায় ব্যবহৃত "প্রাচ্যদেশীয় লৌকিক প্রাদেশিক ভাষার" মধ্যে "বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ তুলনামূলকভাবে প্রধান এবং পরিমাণে বেশি" (অতনুশাসন, ২০১২ : ৭৪-১০০)।

চর্যাপদের ভাষা-সম্পর্কিত বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিতবর্গের মতামতের মধ্য দিয়ে এর নানা মাত্রা অনুধাবনীয়। সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ভাষাবৈশিষ্ট্যের, বিশেষত পূর্ব ভারতের ভাষাবিকাশের স্বরূপটিও উপলব্ধিযোগ্য।

গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি

অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়, ২০১২। *দশদিশি*, কলকাতা।

অলিভা দাক্ষী, ২০১১। *চর্যা-গীতি ভাষা ও শব্দকোষ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

আনিসুজ্জামান (সম্পা.), ২০০৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

খগেশ্বর, ১৯৬৫। মহাপাত্র, *চর্যাগীতিকা*, কটক।

জয়কান্ত মিশ্র, ২০০২। *মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাস* (অনুবাদ : উদয় নারায়ণ সিংহ), সাহিত্য একাডেমি, দিলি- ।

তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ১৩৮৫। *চর্যাগীতি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

দীনেশচন্দ্র সেন, ১৯৯৩। *বৃহৎ বঙ্গ*, দ্বিতীয় খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

ধর্মবীর ভারতী, ১৯৮৮। *সিদ্ধ সাহিত্য* (হিন্দি), বিদ্যা প্রকাশন মন্দির, দিলি- ।

নির্মল দাশ, ২০১০। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

নীলরতন সেন, ১৯৭৪। *চর্যাগীতির ছন্দ পরিচয়*, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

নীলরতন সেন, ২০০১। *চর্যাগীতিকোষ*, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

পরীক্ষিত হাজরিকা, ১৯৯২। *চর্য্যাপদ* (অসমিয়া), গুয়াহাটি।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ১৪০৪। *বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য*, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

মনসুর মুসা (সম্পা.), ১৯৭৪। *বাংলাদেশ*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পা.), ১৩৬৪। *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহম্মদ শহীদুল-াহ্, ১৯৫৩। *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খণ্ড, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা।

মৃণাল নাথ, ২০১১। *চর্যাপদ*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৪১৯। *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।

সুকুমার সেন, ১৯৫৬। *চর্যাগীতি পদাবলী*, বর্ধমান সাহিত্যসভা, বর্ধমান।

সুকুমার সেন, ১৯৯৩। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সুকুমার সেন, ১৯৯৪। *ভাষার ইতিবৃত্ত*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সুকুমার সেন, ১৯৯৫। *চর্যাগীতি পদাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সুকুমার সেন, ২০০৭। *বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস*, সাহিত্য অকাদেমি, দিলি- ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৪। *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৯১৬। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা*, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, কলকাতা।

হেমচন্দ্র গোস্বামী (সম্পা.), ১৯২৯। *আসামিয়া সাহিত্যের চানেকি*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

Alex Wayman, 2005. *The Buddhist Tantras*, Motilal, Delhi.

Bijoy Chandra Majumdar, 1920. *History of Bengali Language*, University of Calcutta.

Birinchi Kumar Barua, 1964. *The History of Assamese Literature*, Calcutta.

Chittaranjan Das n.d., *Glimpses of Oriya Literature*.

Dinesh Chandra Sen, 1911 & 1954. *History of Bengali Language and Literature*, Calcutta.

Jayakanta Misra, 1949. *History of Maithili Literature*, Vol. 1, Alahabad.

Jayakanta Misra, 1962. *The History of Maithili Literature*, Sahitya Academy, Delhi.

Kageswar Mahapatra, 1975. *Pratna-Udiya*, Chattak.

Muhammad Shahidullah, 1966. *Buddhist Mystic Songs*, Renaissance Printers, Dhaka.

Prabodh Chandra Bagchi, 1938. 'Materials for a Critical Edition of the Old Bengali Caryapadas', *Journal of the Department of Letters*, Vol. XXX, University of Calcutta.

Prabodh Chandra Bagchi, 1975. *Studies in Tantra*, University Calcutta.

Rabindranath Tagore (ed.), 1924. *Visvabharati Quarterly*, Shantiniketan.

Sashibhusan Das Gupta, 1976. *Obscure Religious Cults*, Firma KLM, Calcutta.

Subadhra Jha, 1958. *The Formation of the Maithili Language*, Luzae & Company, London.

Suniti Kumar Chatterji, 2002. *The Origin and Development of the Bengali Language*, Rupa & Company, Calcutta.

Tarapada Mukherji, 1963. *The Old Bengali Language and Text*, University of Calcutta.

Tsuyoshi Nara 1979. *Avahattha and Comparative Vocabulary of New Indo-Aryan Languages*, Tokyo University of Foreign Studies.